

আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হুদায়বিয়াহর উমরাহ ٦ سَنَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ هـ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

এ সন্ধির দফাসমূহের সারসংক্ষেপ (مَاذَا يَتَمَخَّضُ عَنْ بُنُودِ الْمُعَاهَدَةِ):

ইসলামের ইতিহাসে দিকে পরিবর্তনকারী এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি হচ্ছে হুদায়বিয়াহর সন্ধি। যে ব্যক্তি এ সন্ধির দফাগুলো এবং পরবর্তী দৃশ্যপট সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন এটা তাঁর নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, এ সন্ধি ছিল মুসলিমগণের জন্য একটি বিরাট বিজয় স্বরূপ। কারণ এর পূর্ব পর্যন্ত কুরাইশগণ ইসলামী সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্বই স্বীকার করত না। এমন কি একে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এরা ছিল বদ্ধপরিবদ্ধ। তারা এ অপেক্ষায় ছিল যে, এক দিন না একদিন এদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। অধিকন্তু, কুরাইশগণ আরব উপদ্বীপে ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং পার্থিব প্রধানের দায়িত্বে সমাসীন থাকার কারণে ইসলামী দাওয়াত এবং সাধারণ মানুষের মাঝে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক ছিল।

এর পরবর্তী দৃশ্যপট বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ সন্ধিতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মুসলিমগণের কিছুটা নতি স্বীকার করার কথা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে ছিল মুসলিমগণের শক্তির স্বীকারোক্তি এবং এ সত্যের স্বীকৃতি যে ইসলামী শক্তিকে পিষ্ট কিংবা নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা কুরাইশদের নেই।

তৃতীয় দফার ক্ষেত্রে এটা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, কুরাইশগণের নিকট পরিবর্তিত পরিস্থিতির ব্যাপারটি তাদের অতীতের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে তেমন কোন সচেতনতা যেন ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের ভূমিকা যে ছিল শীর্ষস্থানে এ কথাটি তারা প্রায় ভুলতেই বসেছিল। অধিকন্তু, আরব উপদ্বীপের সাধারণ মানুষের কথাটাও যেন তাদের চিন্তা ও চেতনার বাইরে নিষ্কিপ্ত হয়েছিল। আরব উপদ্বীপের সকল সাধারণ মানুষ যদি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তাতেও যেন তাদের মাথা ব্যথার আর তেমন কিছুই ছিল না এবং এ ব্যাপারে তারা আর কোন প্রতিবন্ধকও হবে না। কুরাইশগণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সংকল্পের প্রেক্ষাপটে এটা কি তাদের জন্য প্রকাশ্য পরাজয় ছিল না? পক্ষান্তরে, মুসলিমগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে এটা কি তাদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় ছিল না?

অবশেষে মুসলিম ও ইসলামের শত্রুদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল এর লক্ষ্য এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কী ছিল যে, বিশ্বাস বা দ্বীনের ব্যাপারে জনসাধারণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং ক্ষমতার অধিকারী হবে? অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী যে ব্যক্তি যা ইচ্ছা করবে তাই অবলম্বন করতে পারবে? মুসলিম হতে চাইলে মুসলিম হবে, আর কাফের থাকতে চাইলে কাফের থাকবে। তাদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার সামনে কোন শক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মুসলিমগণের এ ইচ্ছা তো কখনই ছিল না যে শত্রুদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হোক , তাদেরকে মৃত্যু ঘাটে অবতরণ করা হোক এবং জোরজবরদস্তি করে মুসলিম করা হোক। অর্থাৎ মুসলিমগণের উদ্দেশ্য এটা ছিল যা আল-কুরআন বর্ণনা করছে,

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

‘কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক’। (সূরাহ আল-কাহফ ১৮ : ২৯)

লোকেরা যা করতে চায় এ ব্যাপারে কোন শক্তিই যেন বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এ সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমগণের উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাদি অর্জিত হয়ে গেল এবং সে সব এভাবে অর্জিত হল যে, অধিকাংশ সময় যুদ্ধে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেও তা সম্ভব হয় নি। সন্ধির মাধ্যমে প্রচার কাজের ঝুঁকি এবং বিপদাপদের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়ায় ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ময়দানে মুসলিমগণ অভূতপূর্ব কৃতকার্যতা অর্জন করতে থাকেন। সন্ধির পূর্বে যে ক্ষেত্রে মুসলিমগণের সৈন্য সংখ্যা কখনই তিন হাজারের অধিক হয় নি, সে ক্ষেত্রে সন্ধির পর মাত্র দু' বছরের ব্যবধানে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তা দশ হাজারে পৌঁছে গেল।

দ্বিতীয় দফাও প্রকৃতপক্ষে এ প্রকাশ্য বিজয়েরই অংশ ছিল। কারণ, সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মুশরিকগণই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

[وَهُمْ بِدُؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ] (التوبة: 13)

‘প্রথমে তারাই তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল।’ [আত্-তাওবাহ (৯) : ১৩]

যে অঞ্চল পর্যন্ত মুসলিম প্রহরী চক্র বা টহলদারী সৈন্য দলের কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল মুসলিমগণের এটা উদ্দেশ্য এবং আশা ছিল যে, কুরাইশগণ তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত অহংকার পরিহার করে আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে এবং সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে কার্যাদি সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষই আপন আপন লক্ষ্য কার্যাদি নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এখন চিন্তা করে দেখলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতির সন্ধি ছিল তাদের অর্থহীন অহংকার এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার। অধিকন্তু, এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, যারা যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল তারা দুর্বল এবং পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে স্থায়ী উদ্দেশ্য হাসিল করতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়ে গেল।

প্রথম দফার প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করলেও এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, আপাত দৃষ্টিতে মুসলিমগণের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাঁদের সাফল্যেরই প্রতীক। কারণ, এ শর্তের মাধ্যমে মুসলিমগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন যেখানে তাঁদের প্রবেশের ব্যাপারে কুরাইশরা ইতোপূর্বে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। তবে এ শর্তের মধ্যে কুরাইশদের পরিতৃপ্ত হওয়ার যে বিষয়টি ছিল তা হচ্ছে, তারা ঐ বছরের জন্য মুসলিমগণকে মক্কায় প্রবেশ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সফলকাম হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল নিতান্ত গুরুত্বহীন একটি সাময়িক ব্যাপার।

এ সন্ধির ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনার আরও একটি বিষয় হচ্ছে, কুরাইশগণ মুসলিমগণকে তিনটি বিষয়ে সুযোগদানের বিনিময়ে তারা মাত্র একটি সুযোগ গ্রহণ করেছিল যা ৪র্থ দফায় উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ ছিল খুবই সাধারণ এবং গুরুত্বহীন। এতে মুসলিমগণের কোন ক্ষতি হয় নি। কারণ, এটা একটা বিদিত বিষয় ছিল যে, যতক্ষণ কোন মুসলিম ইসলামের বন্ধনের মধ্যে থাকবে সে ততক্ষণ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এবং মদীনাতুল ইসলাম হতে পলায়ন করতে পারবে না। মাত্র একটি কারণেই সে পলায়ন করতে পারে এবং তা হচ্ছে স্বধর্ম ত্যাগ। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক কোন মুসলিম যখন স্বধর্ম ত্যাগ করবে তখন তো মুসলিম সমাজে তার কোন প্রয়োজন থাকবে না। বরং মুসলিম সমাজে তার উপস্থিতির থেকে তার পৃথক হয়ে যাওয়াই হবে বহু গুণে উত্তম। এ মোক্ষম ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলে কারীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন

[إِنَّهُ مَنْ نَهَبَ مِنْهُمَا فَلْيَبْعِدْهُ اللَّهُ]

অর্থ: যে আমাদের ছেড়ে মুশরিকদের নিকট পলায়ন করল আল্লাহ তাকে দূর করে দিলেন এবং ধ্বংস করে দিলেন।[1]

এরপর অবশিষ্ট থাকে মক্কার সেই সব অধিবাসীর কথা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিংবা ইসলাম গ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল। অবশ্য এ চুক্তির ফলে যদিও তাদের জন্য একটি সান্তনার বিষয় এ ছিল যে, ‘আল্লাহর জমিন প্রশস্ত।’ ইসলামের প্রথম পর্যায়ে মক্কার মুসলিমগণের অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে কি হাবাশাকে মুসলিমগণের জন্য তার বাহুবন্ধন উন্মুক্ত করে দেয় নি যখন মদীনার অধিবাসীগণ ইসলামের নাম পর্যন্ত শোনেনি? অনুরূপভাবে আজও পৃথিবীর যে কোন অংশ মুসলিমগণের জন্য স্বীয় বাহু বন্ধন উন্মুক্ত করতে পারে।

এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, **﴿وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا﴾** (অর্থ: তাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আসলে আল্লাহ তার জন্য যে কোন সুরাহা এবং প্রশস্ততা বের করে দেবেন।[2])

অতঃপর এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদিও বাহ্যিকভাবে কুরাইশগণের সাময়িক মান-মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য তা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাকুলতা, চিন্তাভাবনা, গোত্রীয় চাপ এবং বিপর্যয়ের নিদর্শন। অধিকন্তু, এ থেকে এমনটিও বোধগম্য হচ্ছিল যে, তারা তাদের মূর্তি পূজক সমাজ সম্পর্কে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। তাছাড়া তারা এটাও উপলব্ধি করছিল যে, শিশুদের খেলা ঘরের ন্যায় ঠুনকো ও অর্থহীন সমাজ-ব্যবস্থা এমন একটি ফাঁকা অন্তসারশূন্য এবং অভ্যন্তর ভাগ হতে খননকৃত পরিখার পাশে অবস্থিত যা যে কোন মুহূর্তে ধ্বংসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব এর হেফাজতের জন্য ঐ জাতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল।

অন্যপক্ষে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে উদার অন্তঃকরণের সঙ্গে এ শর্তগুলোর স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন যে, কুরাইশগণের নিকট আশ্রিত কোন মুসলিমকে ফেরত চাইবেন না, তা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত করে যে, প্রস্তর প্রতিম সুদৃঢ় ও সুসংঘঠিত ইসলামী সমাজের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ পুরোমাত্রায় কার্যকর ছিল। এ প্রকার শর্তে সম্মতি জ্ঞাপনের ব্যাপারে তাঁর মনে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কিংবা আশংকার কোনই কারণ ছিল না।

ফুটনোট

[1] সহীহুল মুসলিম ২য় খন্ড ১০৫ পৃঃ, হুদায়বিয়াহর সন্ধি অধ্যায়।

[2] ক সহীহুল মুসলিম ২য় খন্ড ১০৫ পৃঃ, হুদায়বিয়াহর সন্ধি অধ্যায়।